প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় অভিলেখ: সাধারণ সমীক্ষা ও প্রকারভেদ

সাধারণ সমীক্ষা:

'অভিলেখ' এই শব্দটির ইংরাজি সমার্থক শব্দ ও তার ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের দ্বারা পদটির অর্থ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। 'অভিলেখ' পদটির ইংরাজি সমার্থক রূপে 'Epigraphy' এবং 'Inscription' শব্দদুটি ব্যবহৃত হয়। 'Epigraphy' এই ইংরাজি শব্দটি গ্রীক শব্দ epigraphē < epigraphein থেকে এসেছে। গ্রীক 'epi' বা 'ep' উপসর্গ এবং graphein ধাতু সহযোগে epigraphein পদটি গঠিত। epi বা ep এই উপসর্গের প্রাথমিক অর্থ হল 'on; upon', 'over; above', এবং graphein ধাতুর অর্থ হল 'to write' (Webster's II *New Riverside University Dictionary*, 1984. Pages-437,438,545)। অর্থাৎ, epigraphein>epigraphē> epigraphy এর প্রাথমিকভাবে অর্থ দাঁড়াল – 'to write on' (*Concise Oxford English Dictionary*, 2011. Page-480) বা কোনো কিছুর ওপর লেখা। তবে বৃহত্তর ভাবে Epigraphy শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের দ্বারা অভিলেখ বলতে যে কোনো বস্তুর ওপর যে কোনো লিখিত অক্ষরকে বোঝালেও, বিশেষভাবে কোনো কঠিনবস্তুর ওপর উৎকীর্ণ অক্ষর বা অক্ষরসমূহই পারিভাষিকভাবে অভিলেখ পদবাচ্য। এছাড়া প্রাচীনতার শর্তটিও জরুরি, যদিও ঠিক কতটা প্রাচীন হলে কোনো উৎকীর্ণ অক্ষর বা অক্ষরাবলিকে অভিলেখ বলা যাবে সে ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। সংস্কৃত অভি উপসর্গটির মূলেও epi শব্দ রয়েছে। লিখ্ ধাতুর অর্থ আঁচড় কাটা। তাই অভিলেখ শব্দের মুখ্যার্থ হল কোনো বস্তুর উপরে আঁচড় কেটে লেখা। এই অর্থটি সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে ধারণা করা যায়, অভিলেখ শব্দটির অপর ইংরাজি সমার্থক শব্দ Inscription শব্দটির বিশ্লেষণের দ্বারা। 'Inscription' এর মূল ধাতু 'inscribe', যা ল্যাটিন inscrebere থেকে এসেছে। এই ধাতুটির আভিধানিক অর্থ "to write, print or engrave or mark (a surface) with letters or words" (*Webster's Dictionary*. Page- 631).

অতএব, ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অভিলেখ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত কোনো লেখার মূলতঃ দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়–

প্রথমতঃ – লেখাটিকে উৎকীর্ণ হতে হবে। সেটা ছেনি বাটালি দিয়ে খোদাই করে হতে পারে, আঁচড় কেটে হতে পারে, এমবস্ করে হতে পারে, পাঞ্চ করে হতে পারে, ছাঁচ তৈরি করে হতে পারে বা রিলিফের কাজ হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ – খোদাই করে লেখা অক্ষরগুলি কঠিন বা শক্ত কোনো বস্তুতলের ওপর বিদ্যমান থাকবে।

তাই এককথায় বলা যায়, অভিলেখ হল কোনো কঠিন বস্তুর ওপর লিখিত প্রাচীন অক্ষর বা অক্ষরাবলি। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সংস্কৃত অভিলেখে অভিপূর্বক লিখ্ ধাতুর যে সব প্রয়োগ আছে সেখানে এই রকম অর্থই প্রকাশিত। রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি স্তম্ভলিপিতে বলা হয়েছে, খড়্গ বা তরবারির দ্বারা চন্দ্রের বাহুতে কীর্তি অভিলিখিত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়কার মথুরা স্তম্ভলেখে বলা হয়েছে যে যশ বা খ্যাতির জন্য সেটি অভিলিখিত হচ্ছে না (নৈতত্খ্যাত্যর্থমভিলিখ্যতে) এবং এই অভিলিখিত লেখ্যকে যেন কেউ "উপর্যধঃ" না করে অর্থাৎ কোনোভাবে পরিবর্তন না করে (কুর্যাদ্ যশ্চাভিলিখিতমুপর্যধো...)।

অভিলেখ বিষয়ে চর্চা, তার পঠনপাঠন বোঝাতেও Epigraphy শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রখ্যাত অভিলেখবিদ্ D.C. Sircar যথার্থই অভিলেখের সংজ্ঞা দিয়েছেন - "Epigraphy is the study of inscriptions literally means any writing engraved on some object." (*Indian Epigraphy*, 1996. Page-1) ।

ভারতীয় উপমহাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত অভিলেখসমূহ খোদাই করা হয়েছে মূলতঃ পাহাড়ের গায়ে, পাথর-ধাতু-মাটি, কাষ্ঠফলক, কাঠের তৈরী পাতে, স্তম্ভে বা পাত্রে, এমনকি ইঁটের ওপর, প্রাণীর শক্ত খোলায়, হাতির দাঁতের ফলকে, মণিরত্নে এবং অন্যান্য শক্ত বস্তুর ওপর। মূর্তির গায়ে, পাদদেশে, মন্দিরের দেওয়ালে অজস্র অভিলেখ উৎকীর্ণ হয়েছে। আমাদের দেশে পাথরের গায়েই প্রথমে অভিলেখ উৎকীর্ণ হত। খ্রিস্টিয় অব্দের প্রথম দিকেও পাথরই বহুল ব্যবহৃত অভিলেখ রচনার উপাদান ছিল। তবে খ্রিস্টিয় অব্দের গোড়া থেকেই অভিলেখ তামার ওপর উৎকীর্ণ হতে থাকে। যদিও দক্ষিণ ভারতে তখনও পাথরের ওপরই অভিলেখ খোদাই করার ধারা বজায় ছিল। কারণ সেখানে মন্দিরগাত্রে অভিলেখ রচনার রীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র শক্ত বস্তুতলে খোদাইকৃত লেখাই সব সময় অভিলেখ পদবাচ্য নয়, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত অজস্র সীলমোহর ও মুদ্রা যেগুলি ছাঁচে ফেলে তৈরী হত, তাদের লেখনকে,

আবার গুহার দেওয়ালে চিত্রিত বা কাঠের ফলকে কালি দিয়ে রচিত লেখ্য প্রকৃত অর্থে উৎকীর্ণ না হলেও ব্যাপক অর্থে 'অভিলেখ' বলা হয়ে থাকে। আবার খোদাই বা উৎকীর্ণ না করে, চারপাশের জায়গা খুবলে তুলে নিয়ে (scoop) অক্ষরের রূপ পরিস্ফুট করা হলেও তা অভিলেখ পদবাচ্য হতে পারে। যেমন- ফার্সি-আরবী লিপিতে লেখা দেশীয় ভারতীয় অভিলেখসমূহ। প্রসঙ্গতঃ মুদ্রার উপর লেখা অক্ষরকে যে বিশেষ পারিভাষিক নামে ডাকা হয় সেটি হল *legends*.

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অভিলেখের নিদর্শন সিন্ধুসভ্যতার যুগের (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের গোড়া বা তারও পূর্বে) সীলমোহর ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষে ছড়িয়ে আছে। তবে সেইসময়কার প্রাপ্ত প্রায় ২৫০-৪০০ চিত্রলিপিগুলির নিশ্চিত পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। ভারতীয় অভিলেখগুলির মধ্যে কৃতপাঠ প্রাচীনতম অভিলেখ হল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়কার মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনসমূহ। এই অভিলেখগুলি মূলতঃ প্রাকৃত ভাষায় ও আদি ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা। তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু স্থানের অভিলেখে খরোষ্ঠী লিপি এবং আফগানিস্তানে গ্রীক ও অ্যারামাইক ভাষায় ও অক্ষরে লেখা অশোকের দ্বৈভাষিক অভিলেখও পাওয়া গেছে। অশোকের অনুশাসনসমূহকেই কৃতপাঠ প্রাচীনতম অভিলেখ বলা হলেও, বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে শ্রীলঙ্কার অনুরাধপুর নামক স্থান থেকে প্রাপ্ত কিছু ভগ্ন মাটির পাত্র পাওয়া গেছে, যাতে আদি ব্রাহ্মী লিপিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলেখ উৎকীর্ণ আছে। রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এগুলির সময়কাল মৌর্যযুগেরও পূর্বে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে নির্ধারণ করা গেছে। অবশ্য এই অভিলেখের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

প্রাচীন ভারতীয় অভিলেখগুলি মূলতঃ প্রাকৃত ভাষাতেই লেখা হত। এখনও পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা গেছে এরকম প্রাচীনতম অভিলেখের ভাষা প্রাকৃত বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সঠিক ভাবে করা সম্ভব হয়নি বলে সেই সময়কার প্রচলিত ভাষা সম্পর্কেও জানা যায় না। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় থেকে শুরু করে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী তিনশো বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রাকৃত ভাষাই ছিল অভিলেখের মূল ভাষা। এরপর খ্রিস্টিয় প্রথম শতকের গোড়া থেকে "Epigraphical Hybrid Sanskrit" (EHS) এবং সংস্কৃত ভাষা অভিলেখে জায়গা করে নিতে থাকে। এরপর কয়েক শতক ধরে প্রাকৃত, "EHS" এবং সংস্কৃত তিনটি ভাষাতেই অভিলেখ লেখা হতে থাকে। ধীরে ধীরে প্রাকৃত ও "EHS" কে সরিয়ে সংস্কৃত অভিলেখ রচনায় নিজের জায়গা করে

নিতে থাকে। খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতক থেকে উত্তর ভারতীয় অভিলেখ রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রবলভাবে অনুভূত হয় এবং খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতক থেকে অভিলেখ রচনায় প্রাকৃত ভাষার অবলুপ্তি হয়। তবে দক্ষিণ ভারতে প্রাকৃতের অপসরণ ঘটতে খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতক অবধি সময় লেগেছিল।

অভিলেখে ব্যবহৃত প্রাকৃতভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক ব্যাকরণসম্মত প্রাকৃতভাষার অনেক পার্থক্য আছে। বিশেষভাবে অশোকের অনুশাসনসমূহে যে প্রাকৃত ব্যবহৃত হয়েছে, তার রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব এবং বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণের পার্থক্যে বানানশৈলীগত সাম্য বা orthographic standardization একেবারেই বজায় থাকেনি। তাই অনেকে এই প্রাকৃতকে বিশেষ কোনো শ্রেণীভুক্ত করতে না পেরে 'অশোক-প্রাকৃত' এরূপ আখ্যা দিয়েছেন। এই অশোক-প্রাকৃত আবার বৈশিষ্ট্যভেদে তিনটি উপভাষাতে বিভক্ত- প্রাচ্যা, পশ্চিমা এবং উত্তর-পশ্চিমা উপভাষা। অশোকের অনুশাসনসমূহ ব্যতীত মৌর্যকালীন যুগে প্রাপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের অভিলেখগুলি যেমন- মহাস্থানগড় এবং সহগৌরা অভিলেখে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এইসময়কার কেবলমাত্র জোগিমারা গুহাভিলেখতেই শুদ্ধমাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে চোখে পড়ে।

খ্রিস্টিয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর ও মধ্যভারতে, কখনো আবার দক্ষিণ ভারতেও একটি বিশেষ ভাষায় অভিলেখ রচিত হতে থাকে, যার ভাষা পুরোপুরি সংস্কৃতও নয়, আবার প্রাকৃতও নয়, বরং দুটি ভাষারই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ। অনেকে একে মিশ্রিত ভাষা, প্রাকৃত প্রভাবিত সংস্কৃত, সংস্কৃত প্রভাবিত প্রাকৃত প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকেন। তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই ভাষাকে "Epigraphical Hybrid Sanskrit" বা "EHS" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যদিও এই নামটি ভাষার ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন নয়, তথাপি ব্যবহারিক সুবিধার জন্য এটি গৃহীত হয়েছে। মথুরাতে "EHS" এ রচিত বহু অভিলেখ পাওয়া গেছে। শক-পহ্লব যুগের ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কুষাণ সম্রাটদের কোন কোন অভিলেখে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের মিশ্রণ দেখা যায়। তাছাড়া গুজরাটের আন্ধৌ, মহারাষ্ট্রের নাসিক, সারনাথ, কোসাম, সাঁচি এমনকি দক্ষিণ ভারতের নাগার্জুনকোণ্ডাতেও "EHS" এ রচিত অসংখ্য অভিলেখের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টিয় প্রথম শতক থেকেই অভিলেখে সংস্কৃতের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বিদেশীয় শক শাসকদের আদিপর্বের বেশ কিছু অভিলেখ সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ভাষায় রচিত আবিষ্কৃত অভিলেখসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হল আনুমানিক খ্রিস্টিয়

প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত রাজা গাজায়ন সর্বতাতের ঘোসুন্ডী এবং হাথিবাড়া প্রস্তরাভিলেখ। এছাড়াও খ্রিস্টিয় ১৫০ অব্দে রচিত শক-ক্ষত্রপ প্রথম রুদ্রদামনের জুনাগড় প্রশস্তি সালঙ্কার শিষ্ট সংস্কৃত গদ্যে রচিত আভিলেখ সাহিত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। সংস্কৃতে লেখা অভিলেখ সংখ্যায় প্রচুর এবং কয়েক শতক ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে অজস্র সংস্কৃত অভিলেখ রচিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ নবম ও দশম খ্রিস্টাব্দ থেকে অভিলেখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। মারাঠী, হিন্দি, গুজরাটি, কাশ্মীরি, ওড়িয়া, বাঙালি, মৈথিলি, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা অভিলেখে ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে তামিল অনেকটাই প্রাচীন এবং দক্ষিণ ভারতে পল্লব ও আদি চোল রাজাদের তাম্রশাসনে তামিল ও সংস্কৃতে লেখা অভিলেখও দেখা যায়। কখনো কখনো সংস্কৃতের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার বা বৈদেশিক সহাবস্থানে দ্বৈভাষিক কিছু অভিলেখও বিরল নয়।

ভারতীয় অভিলেখের আলোচনা প্রসঙ্গে এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিলেখের শুরুতে অথবা কখনো শেষেও একটি মঙ্গলসূচক চিহ্ন বা শব্দ আবার কখনো বা ইষ্ট দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তুতি করার রেওয়াজ ছিল। অভিলেখের শুরুতে প্রায়ই 'সিদ্ধম্' বা 'স্বস্তি' শব্দ ব্যবহৃত হত। যদিও পরবর্তীকালে 'সিদ্ধম্' শব্দটি প্রতীকে পর্যবসিত হয়ে গেছে। এছাড়াও প্রাচীন অভিলেখগুলিতে স্বস্তিক, ত্রিরত্ন বা নন্দিপদ (Trident-on-wheel) , শ্রীবৎস (খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখে স্বস্তিক চিহ্নের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে), রেলিং ঘেরা গাছ এবং কিছু অজ্ঞাতার্থ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

অভিলেখের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে- এখানে সাধারণতঃ শব্দ বা শব্দসমষ্টির মাঝে ফাঁক রাখা হত না; কখনো কখনো কিছু শব্দসমষ্টিকে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, কিন্তু তা একেবারেই খোদাইশিল্পীর নিজস্ব ইচ্ছায়। বাদ পড়ে যাওয়া অংশ কাকপদ বা হংসপদ চিহ্নের দ্বারা মার্জিনে লেখা হত। ভুল অক্ষরকে কখনো নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস বা রেখার সাহায্যে কেটে দেওয়ার প্রয়াস চোখে পড়ে। অভিলেখের শেষে বা শ্লোকের শেষে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার আবার কোথাও বা পদ্ম, বৃত্ত, ফুল বা অন্যান্য চিহ্নের ব্যবহারও দেখা যায়।

দীর্ঘতার দিক থেকে অভিলেখ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কখনো কখনো অভিলেখ একটি শব্দ বা চিহ্ন যুক্ত হতে পারে, যা কোনো ব্যক্তির নাম নির্দেশ করে। প্রায়শই কোনো তীর্থযাত্রী তার নাম তীর্থযাত্রা উদযাপনের উদ্দেশ্যে মন্দির বা তীর্থস্থানে খোদাই করে রেখে যেত। এগুলি ক্ষুদ্র অভিলেখ। আবার কখনো মহাকাব্য বা জাতক

থেকে কোনো ঘটনা খোদাই করা হত। মহাকাব্যের বা নাটকের ধরনে রচিত অভিলেখগুলি আকারে দীর্ঘ অভিলেখগুলির মধ্যে অন্যতম। আজমীর এর আড়াই দিন কা ঝোপড়া এর মসজিদ থেকে প্রাপ্ত ললিতবিগ্রহরাজ ও হরকেলি নাটক এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অভিলেখের প্রকারভেদ:

ভারতীয় উপমহাদেশে বিপুল সংখ্যায় অভিলেখ পাওয়া গেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভাষা, লিপি, আকৃতি, বিষয়বস্তু, উপাদান, কাল, প্রচারকর্তা, প্রচারের উদ্দেশ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে তাদের বৃহত্তরভাবে মূলতঃ দু'টি শ্রেণিতে অর্থাৎ (অ) বিষয়গত দিক থেকে এবং (আ) উপাদানগত দিক থেকে ভাগ করে আলোচনা করলে অভিলেখের বিভাগ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

(অ) বিষয়গত বিভাগ:

অভিলেখসমূহকে তাদের বিষয়বস্তু ও প্রচারের উদ্দেশ্যে অনুসারে যে ক'টি ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নে উল্লিখিত হল -

(১) রাজপ্রশস্তি এবং দানমূলক অভিলেখ – রাজার দ্বারা বা রাজার পক্ষ থেকে কোনো দানমূলক ঘোষণা এবং স্তুতিবাক্যকে 'প্রশস্তি' বলা হয় এবং এগুলি সাধারণত প্রস্তরফলকে বা স্তম্ভে খোদাই করা হত। যদিও রাজার স্তুতি করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল, তথাপি এই অভিলেখগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ প্রশস্তিমূলক। বরং তাদের সবক'টিই কিছু দান বা স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে এবং এটিই অভিলেখগুলি উৎকীর্ণ করার উদ্দেশ্য। তাই রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখ এরূপ পৃথক বিভাগ করা সম্ভব হয় না, কারণ এদের একের বহু বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে বিদ্যমান।

রাজার আদেশ বা অনুশাসনমূলক অভিলেখের সংখ্যা খুবই কম এবং অশোকের অভিলেখগুলিই বলা যেতে পারে একমাত্র অভিলেখ যা প্রজাদের মধ্যে রাজার ইচ্ছা বা আদেশ প্রচারের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। পুরোপুরি প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে রচিত অভিলেখও প্রাচীন যুগেই সীমাবদ্ধ। এদের মধ্যে সহগৌরা ও মহাস্থানগড় অভিলেখ দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে রাজপ্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় লিপিবদ্ধ করে। আবার খারবেলের হাতিগুম্ফা অভিলেখ কালানুক্রমিকভাবে রাজ্যবর্ষ অনুযায়ী রাজার কীর্তি উৎকীর্ণ করেছে। এই অভিলেখটিই সম্যকভাবে রাজপ্রশস্তিমূলক অভিলেখের বৈশিষ্ট্য বহন করছে, যা অন্যত্র বিরল। অবশ্য এটিও

একটি দানের ঘোষণা করছে। জৈন অর্হৎদের উদ্দেশ্যে খারবেলের গুহা দানের কথা এই প্রশস্তির শেষে বলা হয়েছে।

উত্তরকালীন যে অভিলেখগুলি কোনো বিশেষ দান বা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শাসকের স্তুতি উৎকীর্ণ করে, সেগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। এগুলির মধ্যে স্তম্ভাভিলেখ সেই স্তম্ভটিরই প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করতে পারে। কোনো কোনো রাজা তাঁর জয়ের পরে 'জয়স্তম্ভ' বা 'কীর্তিস্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করান এবং সেই জয়কে চিরস্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে অভিলেখও উৎকীর্ণ করান। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি এবং যশোধর্মনের মান্দাসোর স্তম্ভাভিলেখ এই শ্রেণির অভিলেখ। অন্যান্য কিছু স্তম্ভাভিলেখ প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে এবং সেগুলি কোনো বিশেষ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। যেমন- বেসনগর স্তম্ভাভিলেখে গরুড়ধ্বজ এবং মেহেরৌলি স্তম্ভাভিলেখে বিষ্ণুধ্বজ উৎসর্গ করে অভিলেখ উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

শাসকের দ্বারা কোনো মন্দির নির্মিত হলে, মূর্তি স্থাপিত হলে অথবা তড়াগ খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজে কিছু প্রতিষ্ঠা করা হলে সাধারণত প্রস্তরফলকে, কখনো কখনো স্তম্ভে অভিলেখ উৎকীর্ণ করানো হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালেখ একটি জৈনমন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রস্তরাভিলেখ প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের কোনো স্থানে সংলগ্ন ছিল। অভিলেখ রচনার একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল- বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, জনসাধারণের জন্য কূপ খনন প্রভৃতি নথিবদ্ধ করা। রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ এবং শান্তিবর্মনের সময়কালীন তালগুন্দ অভিলেখ এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রাচীন সময়ে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে গুহা দান করার কথা গুহার দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা হত। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাউকে গ্রাম বা অন্যকিছু দান করলে তাও অনেকসময় মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা থাকত। মঙ্গলেশের মহাকূট অভিলেখ এর উদাহরণ।

রাজপ্রশস্তি ও দানমূলক অভিলেখগুলির বৈশিষ্ট্য হল- এগুলি কখনো সম্পূর্ণরূপে গদ্যে রচিত; যথা- হাতিগুম্ফা, জুনাগড়, মহাকূট অভিলেখ; কখনো আবার তা গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে রচিত, যথা এলাহাবাদ অভিলেখ; আইহোল, দেওপাড়া প্রভৃতি অভিলেখ আবার শুধু পদ্যে রচিত। রাজার সভাকবি বা প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবিদের দ্বারা এই অভিলেখগুলি রচিত হওয়ায় এগুলি সংস্কৃত শিষ্ট কাব্যগুণে সমৃদ্ধ।

আবার কোন কোন মহাকবির নাম বা রচনা শুধু অভিলেখ সাহিত্যের মধ্যেই বেঁচে আছে। তাঁদের অন্য রচনা পাওয়া যায় না। যেমন- এলাহাবাদ অভিলেখের রচয়িতা হরিষেণ; আইহোল প্রশস্তির প্রণেতা রবিকীর্তি।

এই ধরনের প্রশস্তিমূলক ও দানমূলক অভিলখগুলি প্রায়শই মঙ্গলসূচক কোনও চিহ্ন অর্থাৎ স্বস্তিক প্রভৃতি অথবা 'স্বস্তি' শব্দ লিখে তারপর একটি বা দুটি মঙ্গলাচরণ শ্লোক দিয়ে শুরু হত। এরপর থাকত শাসকের বংশপরিচয় যা অত্যন্ত প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে রচিত এবং তাতে পূর্বপুরুষদের ক্ষমতা, সৌন্দর্য, তাঁদের নীতিগত চারিত্রিক আদর্শের কথা, যশ, জয়ের তালিকা, শিক্ষা, শিল্পবোধ প্রভৃতি বিধৃত থাকত। অভিলেখের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ কোনো কিছু উৎসর্গ করার কথা একেবারে শেষের দিকে থাকত। তার পরে আশীর্বাদসূচক বাক্য অথবা রচয়িতার নাম সম্বলিত উপসংহার লেখা শ্লোক থাকত। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রশস্তি রচনার এই ধারা অনেক পরবর্তীকালীন। কিন্তু শুরুর দিকে অর্থাৎ প্রাচীনকালের অভিলেখগুলি মূলতঃ তাদের সাহিত্যিক গুণের দিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে রচিত হত এবং অভিলেখ যে বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হত, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিত। রুদ্রদামনের জুনাগড় অভিলেখ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২) ভূমিদান পত্র (তাম্রশাসন)- ভূমিদানাদি বিষয়ক অভিলেখ প্রায়শই তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করা হত এবং এই তাম্রপট্টে দানাদি অভিলেখের সংখ্যা সহস্রাধিক। এগুলি 'শাসন' নামেও পরিচিত। এরূপ শাসনাদি একটি বা একাধিক তাম্রপট্টে খোদাই করা হত এবং এগুলি চওড়ায় বিস্তৃত হত; এদের আকার পুথি লেখার জন্য ব্যবহৃত তালপত্র, ভূর্জপত্র বা ছোটো প্রস্তরফলকের আকারের মতই হত। দু'থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি থেকে ছ'ইঞ্চি চওড়া বিশিষ্ট তাম্রপট্টে রচিত অভিলেখ যেমন পাওয়া গেছে; পরবর্তীকালে তেমনি পনেরো থেকে কুড়ি ইঞ্চি চওড়া বিশিষ্ট তাম্রপট্টও চোখে পড়ে। লেখাকে ক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে এগুলি তৈরি হত এবং তাম্রপট্টের একেবারে ওপরের পট্টটির ধারগুলো বাড়িয়ে বাড়িয়ে রাখা হত ও সেটিতে কিছু না লিখে ফাঁকাই রাখা হত। এই পট্টগুলিকে একসাথে করে সেগুলিতে ছিদ্র করা হত এবং তার মধ্যে একটি বা দুটি তামা অথবা ব্রোঞ্জের আংটা দিয়ে তাম্রপট্টটিকে বাঁধা হত। আংটার শেষপ্রান্ত একটা ব্রোঞ্জের সীল বা রাজার নামমুদ্রা দ্বারা ঝালিয়ে নেওয়া হত, যা তাম্রশাসনটি যে জাল বা নকল নয় তার প্রমাণ এবং তারফলে কোনো অতিরিক্ত তাম্রপট্ট সংযোগ বা কোনো পট্টের অপসরণ থেকেও মূল শাসনটিকে রক্ষা করা যেত। অবশ্য এরপরও অসৎ উদ্দেশ্যে যে জাল বা নকল দানপত্র তৈরি করা হত

না তা নয়। কখনো আবার আকারে বেশ বড় একটিই তাম্রপট্টে অভিলেখ উৎকীর্ণ করানো হত এবং তার মাথার ওপরে রাজার সীল আটকানো থাকত। পালরাজা মহেন্দ্রপালের সপ্তম রাজ্যবর্ষে জারি করা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলা থেকে প্রাপ্ত জগ্‌জীবনপুর তাম্রশাসনটি এরূপ একক তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ।

তাম্রশাসনাদি উৎকীর্ণ করার উদ্দেশ্য ছিল রাজা বা রাজশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পন্ডিত, সৎ বা জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম অথবা ভূমি দান করার বিষয় নথিবদ্ধ করা। কখনো কখনো মন্দির বা অন্য ধার্মিক ক্ষেত্রেও দান করার কথাও তাম্রশাসনে লেখা হত। দানপ্রাপক সাধারণত দানের জমি বা বস্তুর ওপর সকল প্রকার অধিকার পেতেন এবং লভ্য করও ভোগ করতেন। তাম্রশাসনগুলিতে দানের এবং দানপ্রাপকের অধিকারের বিস্তৃত বিবরণও থাকত।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়কার দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও শালঙ্কায়ন রাজবংশের তাম্রশাসনই প্রাচীনতম রূপে চিহ্নিত। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত তাম্রশাসনের মধ্যে উত্তরভারতের ঈশ্বররাত-এর কলাছলা শাসনই (আনুঃ খ্রিঃ চতুর্থ শতকের শেষভাগ) প্রাচীনতম। তবে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকের পূর্বে যে তাম্রশাসন রচনার কোনো প্রচলন ছিল না, এমন নয়। পশ্চিমক্ষত্রপ এবং নাসিকের সাতবাহন রাজাদের (খ্রিঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতক) গুহাতে উৎকীর্ণ কিছু দানাভিলেখ পাওয়া গেছে, যেগুলি মূল কোনো তাম্রপট্টে খোদাই করা থাকত। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থেও, যেমন বিষ্ণুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ভূমিদানের বিষয় তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ করানোর কথা জানা যায়। সেখানে শাসনের 'তাম্রশাসন', 'তাম্রপট', 'তাম্রফলী', 'দানশাসন' এরূপ নাম পাওয়া যায়।

গুপ্তযুগে তাম্রশাসনাভিলেখ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় প্রচলিত হতে থাকল এবং ক্রমশ পট্টগুলি মাপে বড় ও বিষয়ে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে থাকল। দানের অংশ শুরু করার পূর্বে শাসকের বংশপরিচয় ও তাঁর প্রশংসার কথা যত বেশি বলা হত, সেই তাম্রশাসনের আকার তত বড় হতে থাকল। এদিক থেকে দেখতে গেলে বিস্তৃতভাবে রচিত তাম্রশাসনগুলি প্রশস্তিমূলক প্রস্তরাভিলেখের সঙ্গে বিষয়বস্তু ও রচনারীতির দিক থেকে সাদৃশ্য বজায় রাখে। তাম্রশাসনাভিলেখ উৎকীর্ণ করানোর এই ধারা মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক যুগেও চলেছিল। বর্তমান সময়েও কোথাও কোথাও এই তাম্রপট্ট আইনত সিদ্ধ বা গ্রহণযোগ্য।

তাম্রশাসনাভিলেখের দানের অংশটি বা কাজের অংশটি গদ্যে লেখা হত, কিন্তু শাসকের বংশপরিচয় পদ্যে শ্লোকাকারে ও সালংকার ভাষায় লেখা হত। খুবই কম

অভিলেখ পাওয়া যায়, যেগুলি সম্পূর্ণভাবে শ্লোকাকারে রচিত এবং এর একটি অন্যতম উদাহরণ হল রঘুদেবের রাজামুন্ডী শাসন।

ভূমিদান বিষয়ক বা অন্যান্য দান বিষয়ক এই শাসনগুলিকে অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী উপাদানে না উৎকীর্ণ করিয়ে তামার ওপর উৎকীর্ণ করানোর উদ্দেশ্য ছিল তাকে স্থায়িত্ব দেওয়া। নিরাপদে তাম্রশাসন সংরক্ষণের জন্য দানপ্রাপক ও তাঁর উত্তরসূরীরা এগুলিকে মাটির নীচে সংরক্ষিত রাখতেন।

একটি পূর্ণ সালংকাররীতিতে লেখা তাম্রশাসনাভিলেখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হত-

- **প্রস্তাবনা :-**

(ক) মঙ্গলাচরণ– তাম্রশাসনের শুরুতেই মঙ্গলসূচক শব্দ 'সিদ্ধম্' লেখা থাকে। কখনো তা আবার প্রতীক দ্বারাও সূচিত হয়। এরপর বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁদের স্তুতিসূচক একটি বা একাধিক মঙ্গলাচরণ শ্লোক থাকে।

(খ) স্থান– তাম্রশাসনটি যে স্থান থেকে জারি করা হয়, মূলত রাজার রাজধানী বা অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটি (জয়স্কন্ধাবার), তার উল্লেখ থাকে মঙ্গলাচরণের পরে। প্রায়ই স্থানের নাম একটি বা একাধিক শব্দ দ্বারা পঞ্চমী বিভক্তিতে উল্লিখিত হয়। অলংকৃত অভিলেখের ক্ষেত্রে ঐ স্থানের বিস্তৃত বিবরণ থাকে।

(গ) দাতার নাম ও বংশপরিচয়– দাতার নাম অর্থাৎ সাধারণতঃ রাজার নাম, তাঁর সমস্ত উপাধি সহ এবং বিস্তারিত বংশপরিচয় উল্লেখ থাকে তাম্রশাসনে। সাড়ম্বরে অতিরঞ্জিত করে দাতার বংশের ইতিহাস তাম্রশাসনে লেখা হয়। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও এই অংশের গুরুত্ব রয়েছে।

(ঘ) বিজ্ঞপ্তি– দাতার পরিচয় প্রদানের পর নির্দিষ্ট কর্মকর্তা, আধিকারিক এবং বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হয়, যাদের এই দান সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। 'আজ্ঞাপয়তি' বা 'আদিশতি' প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্ম হিসাবে বাক্যে তাদের উল্লেখ থাকে; এর পরে 'বিদিতম্ অস্তু ভো যদ্'.... প্রভৃতি লেখা থাকে। এই আধিকারিকের নামের উল্লেখ থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে প্রশাসনতন্ত্র সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় ।

- **প্রজ্ঞাপন :-**

(ক) দানের পরিচয়- শাসনটিতে এরপর প্রদেয় ভূমি, তার নাম ও অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করা থাকে। এগুলি একটি বা একাধিক গ্রাম বা ভূমি হতে পারে।

সেগুলি কোন্ কোন্ বিষয়, মণ্ডল, ভুক্তি প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্গত, তা উল্লিখিত হয়। 'সীমন্', 'আঘাটন' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ভূমির সীমা নির্দিষ্ট করা থাকে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম তার প্রাকৃতিক ও মনুষ্যকৃতচিহ্ন যেমন – নদী, বন, চিহ্নিত পাথর প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। এরপরে 'পরিহার' অর্থাৎ দানপ্রাপক যা যা সুযোগ-সুবিধা পাবেন তার তালিকা থাকে। যেমন, সাম্রপনসা, সগুবাকনালিকেরা (ঐ ভূমিতে উৎপন্ন আম-কাঁঠাল, সুপারি-নারকেল সহ; অর্থাৎ এগুলি ভোগের অধিকার সহ), অকিঞ্চিত্প্রগ্রাহ্যা (এই ভূমি থেকে কোনো কর গৃহীত হবে না) ইত্যাদি। এছাড়া পূর্বে গ্রামবাসীরা যে সব সুযোগ সুবিধা রাজকার্যে নির্গত রাজপুরুষদের দিতে বাধ্য থাকত সেগুলি থেকেও দানগ্রহীতাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হত। এগুলিকে পরিহার বলা হত।

(খ) গ্রাহকের নাম– এরপর গ্রাহক বা গ্রাহকদের নাম (সাধারণত ব্রাহ্মণ), তাদের যথাযথ পরিচয়, জন্মস্থান, বাসস্থান, শাখা, গোত্র প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। কখনো কখনো গ্রহীতার মহানুভবতা, পুণ্য প্রভৃতির প্রশংসা করা হয়। গ্রাহকের সংখ্যা এক থেকে একশো বা তারও বেশি হতে পারে। রাজেন্দ্র চোল এর করন্দৈ অভিলেখতে ১০৮৩ জন দানগ্রহীতার নাম আছে। একাধিক গ্রহীতা হলে তারা দানের যে যে অংশ যেভাবে ভোগ করবে, তার পৃথক উল্লেখ থাকে।

(গ) উপলক্ষ– ভূমিদান বিষয়ক দানগুলি সাধারণত জ্যোতিষশাস্ত্র মেনে কোনো পুণ্যদিনে, নির্দিষ্ট উপলক্ষে করা হত। যেমন– সংক্রান্তি, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দিনে এই দান সম্পন্ন হত। তবে অনেক অভিলেখই এই ধরনের উল্লেখ করে না।

(ঘ) দানের উদ্দেশ্য– দাতা সাধারণত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে যেমন পুণ্য অর্জনের জন্য, দীর্ঘায়ু লাভের জন্য যশ অথবা নিজের বা পিতামাতার ইহজীবনে ও পরজীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দান করতেন। এই অংশ অনেক দানপত্রেই থাকে না। কখনো আবার ব্রাহ্মণের প্রতিদিনের অনুষ্ঠেয় বৈদিক যাগাদি, ভোজন বা মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্যও দানের উল্লেখ থাকে।

- **উপসংহার :-**

(ক) ধর্মানুশংসন - তাম্রশাসনগুলির অন্তে ধর্মানুশংসন শ্লোক সংযোজিত হত। এগুলি সংখ্যায় এক, দুই বা ততোধিক হতে পারে এবং সেগুলি শাসন রচয়িতার নিজস্ব রচনা নয়। সেগুলি প্রধানতঃ মহাভারত, পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া। এই শ্লোকগুলিতে ভূমিদানের ও দাতার প্রশংসা, দানের অমর্যাদাকারী ও অপহারকের উদ্দেশ্যে নিন্দা বা অভিশাপ বাণী আছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া

যেতে পারে-

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্।।

অথবা,

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচতে।।

(খ) তারিখ – অভিলেখগুলি অনেক সময়ই তারিখযুক্ত হয়। কখনো তাতে সাল (অব্দ বা বিশেষ কোনো রাজার রাজত্বকাল) উল্লিখিত থাকে; পরবর্তীকালীন অনেক অভিলেখে মাস, পক্ষ, তিথি, বার, নক্ষত্র প্রভৃতি সহ বিস্তৃত কালোল্লেখ থাকে।

(গ) আধিকারিক ও রাজপুরুষদের নাম – তাম্রশাসনের শেষের দিকে এক বা একাধিক রাজপুরুষের উল্লেখ থাকে। এঁরা শাসন সংক্রান্ত আদেশ নির্বাহের বিষয়ে যুক্ত থাকেন, এঁদের 'দূতক' বা 'আজ্ঞা' বা 'আজ্ঞপ্তি' বলা হয়। লেখক ও খোদাইকরের নামও কখনো কখনো উল্লেখ থাকে।

(ঘ) প্রমাণীকরণ – অভিলেখটিকে প্রামাণ্য দেওয়ার জন্য এর শেষে তাম্রশাসন জারিকর্তার স্বাক্ষর থাকে এবং সেখানে 'স্বহস্তো মম' এরূপ লেখা থাকে। এরপর তা রাজার নামমুদ্রা অথবা সীল দ্বারা আটকানো থাকে। হর্ষবর্ধনের বাঁশখেরা তাম্রশাসনে সম্রাট হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর আছে।

উপরিউক্ত সকল অভিলেখই শাসকের দ্বারা বা শাসকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধির দ্বারা উৎকীর্ণ। তাই এগুলিকে সরকারী অভিলেখ বলা যায়।

(৩) ব্যক্তিগত দানাভিলেখ - রাজার বা রাজশাসনের পক্ষ ছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ধর্মীয় বহু দান সংক্রান্ত অভিলেখ পাওয়া যায়। এগুলি বেসরকারী অভিলেখ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উৎকীর্ণ অভিলেখ। এগুলি খুব ছোটোও হয় আবার কখনো বিস্তৃত প্রশস্তি আকারে লেখা সংস্কৃতাভিলেখের মতও হয়। এগুলির বেশির ভাগই পাথরে খোদাই করা হয়। তবে মূর্তি দানাভিলেখগুলি কোনো ধাতুতে খোদাই থাকে। এই ধরনের অভিলেখগুলিতে সাধারণত তারিখ (রাজত্বকাল ও অব্দ), দাতার নাম, উপাধি, পেশা, বাসস্থান, দানের প্রকৃতি, দানের উদ্দেশ্য এবং দাতার আত্মীয় ও সহযোগীদের নাম, এই দান থেকে প্রাপ্য পুণ্যের অংশীদার প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে

সালংকার শৈলীতে রচিত অভিলেখ পাওয়া যায় না, এমন নয়। কুমারগুপ্ত ও বন্ধুবর্মনের নামোল্লেখকারী মান্দাসোর প্রস্তরাভিলেখ রেশমশিল্পী গোষ্ঠীর দ্বারা সূর্যমন্দির নির্মাণ ও সংস্কারের কথা লিপিবদ্ধ করে। এই অভিলেখ সরকারী উদ্যোগে রচিত নয়, কিন্তু রাজপ্রশস্তির বহু বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে আছে।

রাজার দ্বারা কৃত দানপত্রর মত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কৃত দানাভিলেখও একই উদ্দেশ্যে রচিত; যেমন – তড়াগ বা কূপ খনন, প্রপা বা জলপানের স্থান নির্মাণ, মন্দির মেরামত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্যহ কার্যনির্বাহের জন্য দান, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য গুহা দান, গ্রাম দান, মূর্তি দান, গ্রাম বা কৃষিভূমি দান প্রভৃতি। বৌদ্ধ দানমূলক অভিলেখগুলি স্তূপ বা অন্যান্য বহনযোগ্য বস্তু দানের কথা লিপিবদ্ধ থাকে। জৈনদের দান অভিলেখ (মূলত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে) মন্দির দেওয়ালে ও মূর্তিতে উৎকীর্ণ করা হত।

(৪) **স্মারক অভিলেখ**- এছাড়াও কোনো মৃত ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মারক অভিলেখ উৎকীর্ণ করা হত। এগুলির অনেক নাম ছিল। মৃত ব্যক্তির কোনো আত্মীয়ের দ্বারা উৎকীর্ণ মূলতঃ প্রাকৃত ভাষায় লেখা অভিলেখগুলি প্রাচীন যুগে পাওয়া যায়। 'লঠি' বা 'যট্' (সংস্কৃতে যষ্টি) স্তম্ভ নামে অভিহিত এই অভিলেখগুলির একটির উদাহরণ– চষ্টণ ও রুদ্রদামণের সময়কালীন অন্ধৌ অভিলেখ। নাগার্জুনকোণ্ডা এবং বৌদ্ধদের অন্যান্য ধর্মস্থানে 'ছায়াখম্ভ' বা 'ছায়াথম্ভ' নামে পরিচিত মূর্তি স্তম্ভ দেখা যায়। 'গোগহন' নামক স্মারক অভিলেখ যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ করানো হত, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল ভানুগুপ্তের সময়কালীন এরাণ অভিলেখ। এছাড়া কিছু সংস্কৃত স্মারক অভিলেখ যেমন- মৃত স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা সাঙ্গসী অভিলেখ; মৃত পুত্রীর উদ্দেশ্যে চন্দ্রাবতী থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ অভিলেখ পাওয়া যায়। মূলতঃ কর্ণাটক ও রাজস্থান থেকে পাওয়া 'সতী' প্রস্তর অভিলেখগুলি সতী স্ত্রীর কথা লিপিবদ্ধ করে। এর উদাহরণ হল- চাহমান রাজা অজয়পালদেবের (১১৩২ খ্রিস্টাব্দে) বস্‌সী অভিলেখ। এগুলি ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন সাধুদের অসংখ্য স্মারক অভিলেখ পাওয়া যায়।

(৫) **Label Inscription** - ভাস্কর্য বা অন্যান্য শিল্পকলার পরিচয় প্রদানের জন্য চিত্র অথবা কোনো মূর্তির পাদদেশে নাম উৎকীর্ণ করানো হত, এগুলি 'Label Inscription' নামে পরিচিত। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নানাঘাটে খ্রিঃ প্রথম শতকের সাতবাহন শাসকদের নির্মিত মূর্তিতে খোদাই করা অভিলেখ। ভগ্ন মূর্তিগুলির নীচে উৎকীর্ণ অভিলেখগুলি থেকেই এই শাসকদের

চেনা যায়। মাট্ (মথুরা) প্রতিকৃতি স্তম্ভ কুষাণরাজ কণিষ্কের নাম উৎকীর্ণ করেছে। এছাড়া ভারহুত স্তূপে প্রচুর Label Inscription পাওয়া যায় যা দেবদেবীর মূর্তিতে উৎকীর্ণ রয়েছে, কখনো আবার বুদ্ধের জীবনী, জাতক এবং অবদানের গল্প চিত্রিত হয়েছে ও সেগুলির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

(৬) **তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের অভিলেখ** - কখনো আবার বিভিন্ন স্থানে তীর্থযাত্রীরা কোনো দেওয়ালে বা মন্দিরের রাস্তায়, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও জৈন ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত স্থানে তাদের যাত্রা লিপিবদ্ধ করে আসত। এগুলিতে খুব সাধারণভাবে শুধু তীর্থযাত্রীর নাম উল্লেখ থাকে। ভুইলী এবং দেবপ্রয়াগ থেকে এই ধরনের একগুচ্ছ অভিলেখ পাওয়া গেছে। জাগেশ্বর নামক স্থান থেকে কয়েক লাইনের বিস্তারিত তীর্থযাত্রীদের অভিলেখও পাওয়া গেছে। ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা ভ্রমণের স্থানে তাদের নাম বা অন্যান্য তথ্যও উৎকীর্ণ করিয়ে রাখত। Chilas, Gilgit, Hunza (বর্তমানে উত্তর পাকিস্তান) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত অনেক ভ্রমণযাত্রীদের নাম সহ অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(৭) **ধর্মীয় অভিলেখ** (Cultic Inscriptions) – পুরোপুরি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত অভিলেখ এই শ্রেণিভুক্ত। হিন্দু ধর্মের বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থ থেকে কোনো অংশ বা স্তোত্র প্রস্তর খণ্ডে বা স্তম্ভে উৎকীর্ণ করানো হয়ে থাকে। শিব (মান্ধাতা থেকে প্রাপ্ত হলায়ুধ স্তোত্র), সূর্য (বিদিশা থেকে পাওয়া চিত্তপের স্তোত্র) প্রভৃতি দেবতার স্তোত্র অভিলেখ পাওয়া গেছে। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের দেওয়ালে *ভগবদ্গীতা* থেকে শ্লোক উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত জৈন ধর্মের অভিলেখ হল বিজোলিয়া প্রস্তর অভিলেখ। বৌদ্ধদের অভিলেখ এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রস্তরখণ্ড, তাম্রপট্ট, সুবর্ণপাত, পোড়ামাটি ইত্যাদি বিবিধ উপাদানে বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির বিভিন্ন অংশ উৎকীর্ণ করা হত। বৌদ্ধরা এই কাজটিকে খুব পবিত্র মনে করতেন। রত্নগিরি, নালন্দা ইতাদি বহু জায়গা থেকে এরূপ অনেক অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(৮) **কাব্য অভিলেখ** – অভিলেখের বিষয়বস্তু যেখানে কাব্য, সেরকম অভিলেখ সংখ্যায় অল্প হলেও খুব উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আজমীর থেকে প্রাপ্ত ললিতবিগ্রহরাজ নাটক ও হরকেলি নাটক; ধার নামক স্থান থেকে পাওয়া পারিজাতমঞ্জরী বা বিজয়শ্রী নাটিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কয়েকটি খণ্ডকাব্য ও মহাকাব্য উৎকীর্ণ রূপে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি মহাকাব্যের উদাহরণ হল উদয়পুরে প্রাপ্ত চব্বিশটি সর্গে রচিত রাজপ্রশস্তি-মহাকাব্য অভিলেখ।

(৯) সীল (seal) অভিলেখ – Seal ও Sealings (seal inscription গুলি উল্টানো ভাবে বা mirror image রূপে থাকে, আর sealing inscription গুলি সোজা দিকে থাকে)। চিঠিপত্র, আইনি এবং প্রশাসনিক নথিকে প্রামাণ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হত। এগুলি অভিলেখের একটি বিশেষ প্রকারভেদ। বহুসংখ্যক এরূপ সীল অভিলেখ একসাথে প্রাচীন বৈশালী থেকে পাওয়া গেছে। এছাড়া ভীটা, নালন্দা, বেসনগর এবং রাজঘাটেও অজস্র এরূপ অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(১০) মিশ্র বা বিচিত্র অভিলেখ - অনেক অভিলেখ আছে যাদের উপরিউক্ত কোনো শ্রেণিতে ফেলা যায় না। তাদের মিশ্র বা বিচিত্র অভিলেখ বলা যেতে পারে। মহাস্থান ও সহগৌড়া অভিলেখকে অন্য কোনো শ্রেণীভুক্ত করা যায় না বলে সেগুলি এই শ্রেণিতে পড়ে। জোগিমারা ও সীতাবেঙ্গা গুহাভিলেখও এই শ্রেণির অন্তর্গত। ব্যাকরণের সূত্র সমন্বিত ঘর কাটা সর্পের মত দেখতে 'সর্পবন্ধ' অভিলেখ উজ্জয়িনী থেকে পাওয়া গেছে। বিশেষ শ্রেণির এই অভিলেখ ছাড়াও কোনো সাধু পুরুষ বা সন্ন্যাসী, রাজাদের পায়ের স্থায়ী ছাপে (foot print inscription) অভিলেখ লেখা হত। নাগার্জুনকোণ্ডায় এরূপ অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(আ) উপাদানগত বিভাগ-

(১) প্রস্তর :

ভারতীয় অভিলেখের বেশিরভাগই উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তরের পৃষ্ঠতলে। সাধারণতঃ নরম ও মসৃণ পাথরে এগুলি উৎকীর্ণ করা হত। প্রস্তরনির্মিত বিভিন্ন আধারের পার্থক্যহেতু যে ভিন্নতা আছে, সেগুলি নিম্নে বিবৃত হল-

(ক) পর্বতগাত্র – পর্বতগাত্রে অভিলেখ খোদাই করার জন্য জায়গাটিকে মসৃণ ও পালিশ করে নিতে হত। অশোকের অভিলেখগুলি অবশ্য সরাসরি রুক্ষ পর্বতগাত্রে বা সামান্য ঘষে মেজে খোদাইয়ের উপযোগী করে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। গির্ণার (জুনাগড়), ধৌলি, মানশেরা, শাহবাজগড়ি, জৌগড় প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত মৌর্যসম্রাট অশোকের মুখ্যগিরি-অনুশাসন সমূহ, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন্ ও গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রশস্তিদ্বয় ইত্যাদি পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ।

(খ) প্রস্তরপট্ট – প্রশস্তি শ্রেণীর দীর্ঘ প্রস্তরাভিলেখগুলি আয়তাকার প্রস্তরপট্টে খোদাই করা হত, যেগুলি আগে থেকেই কেটে রাখা হত এবং খুব যত্ন করে পালিশ করা হত। এগুলি কোনো মন্দিরের দেওয়ালে অথবা অন্যত্র লাগানো

থাকত। অশোকের বৈরাট্ প্রস্তরপট্টানুশাসন, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি প্রভৃতি প্রস্তরপট্টে উৎকীর্ণ।

(গ) প্রস্তরফলক(stone plaque) - মহাস্থানগড় খণ্ডিত অভিলেখ প্রস্তরফলকে খোদাই করা হয়েছে।

(ঘ) পর্বতগুহা – পর্বতগুহাভিলেখের মধ্যে সম্রাট অশোকের বরাবর গুহাভিলেখ, খারবেলের হাতিগুম্ফাভিলেখ এবং নাসিক গুহাভিলেখ সমূহ (গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি, বাসিষ্ঠীপুত্র পুলুমাবি, যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি) ইত্যাদি।

(ঙ) স্তম্ভ ও খাড়াভাবে দণ্ডায়মান প্রস্তরখণ্ড বা ফলক - প্রস্তরের স্তম্ভে উৎকীর্ণ অভিলেখের উদাহরণ হল সারনাথ, দিল্লী–টোপরা, এলাহাবাদ-কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত অশোকের স্তম্ভানুশাসন সমূহ এবং হেলিওদোরাসের বেসনগর গরুড়স্তম্ভ লিপি। পরবর্তী কালের স্তম্ভাভিলেখগুলি প্রায়শই প্রশস্তিমূলক, দানমূলক ও ভক্তিমূলক বৈশিষ্ট্যযুক্ত। খ্রিস্টিয় শতকের গোড়ার দিকের যূপ স্তম্ভলেখগুলি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা লিপিবদ্ধ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- কৌশাম্বী যূপাভিলেখ (১০১ খ্রিঃ), মথুরা যূপাভিলেখ (১০২ খ্রিঃ, বাসিষ্কের সমকালীন) ।

(চ) মন্দির, অট্টালিকা ইত্যাদির অবয়ব - মন্দির, অট্টালিকা ইত্যাদির বিভিন্ন অবয়ব যেমন দেওয়াল, খুঁটি, স্তম্ভ, রেলিং, গেট, দরজা; এমনকি মেঝে বা ছাদেও প্রাচীনকাল থেকে বহু অভিলেখ খোদাই করা হয়েছে। পশ্চিম ভারতের গুহামন্দির, জৈনমন্দির, মধ্যভারতের স্তূপ, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দিরের দেওয়াল প্রভৃতিতে প্রচুর উৎসর্গীকৃত অভিলেখ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- সাঁচীর স্তূপাভিলেখসমূহ, শোডাসের মথুরা কূপাভিলেখ, মথুরাতে প্রাপ্ত দরজার চৌকাঠে উৎকীর্ণ অভিলেখ, মথুরার শৈবমন্দিরাবলি অভিলেখ, চন্ডশ্রীর ভান্ডাগার অভিলেখ, চান্তিশ্রীর শৈলমন্ডপ অভিলেখ।

(ছ) মূর্তি, ভাস্কর্য – প্রস্তর নির্মিত দেবদেবীর মূর্তি, কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের মূর্তিতে আবার কখনো বা রাজার মূর্তিতে মূর্তিদাতার নাম, মূর্তির পরিচয় ইত্যাদি উৎকীর্ণ থাকত। বৌদ্ধমূর্তির ক্ষেত্রে মূর্তির মাথার চারদিকের বর্ণবলয়ে তা উৎকীর্ণ হত। তবে, পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যে মূর্তির পাদদেশেই অভিলেখ উৎকীর্ণ করা হত। এই অভিলেখগুলির মধ্যে সঙ্ঘিলের মথুরা বুদ্ধমূর্তি অভিলেখ, মথুরা কনিষ্কমূর্তি অভিলেখ, পাটনা যক্ষমূর্তি অভিলেখ (মূর্তির স্কন্ধে উৎকীর্ণ), ভারহুতের ভাস্কর্য অভিলেখ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(জ) বহনযোগ্য বস্তু – বিশেষতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে ছোটো ও বহনযোগ্য পাথরের

বস্তুতে অভিলেখ রচনা করার চল ছিল। পাথরের বাটি, প্রদীপ প্রভৃতিও অনেকসময় অভিলেখ রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। এই ধরনের অভিলেখের মধ্যে পিপ্রাওয়া বৌদ্ধ দানি (vase) অভিলেখ, অয়লের প্রস্তরপাত্রাভিলেখ, বিশাখমিত্রের প্রস্তরকুণ্ডাভিলেখ, বরাহের প্রস্তরসম্পুটাভিলেখ, প্রথম রুদ্রসেনের দেবনী মোরী প্রস্তরসম্পুটাভিলেখ উল্লেখ্য।

(২) ধাতু :

ধাতুর মধ্যে যে যে উপাদানে অভিলেখ খোদাই করার কাজে ব্যবহৃত হত সেগুলি নিম্নরূপ-

(ক) তাম্র – অভিলেখ খোদাই করার জন্য তামার ব্যবহার বহুল। ভূমিদানপত্রগুলি সংখ্যায় প্রচুর এবং এগুলি তাম্রপট্টেই লেখা হত। এছাড়াও সংখ্যায় অল্প হলেও কিছু বৌদ্ধ উৎসর্গমূলকনথি তামার ফলকে, দেহাবশেষের আধার তামার পাত্র, তামার হাতা, ঘণ্টা, সীল প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ করা হত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত হল- দমোদরপুর তাম্রশাসনসমূহ, প্রভাবতীগুপ্তার পুনা তাম্রশাসনসমূহ, ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন ইত্যাদি। শাসন ব্যতীত কিছু বৌদ্ধলেখ পাওয়া যায় যেমন- প্রথমকনিষ্কের সুইবিহার তাম্রপট্টাভিলেখ, কুর্‌রম- তাম্রসম্পুটাভিলেখ, তক্ষশিলার খরোষ্টী তাম্রচমসাভিলেখ, চম্বা তাম্রঘন্টাভিলেখ, তক্ষশিলা তাম্র হস্তমুদ্রাঙ্কাভিলেখ ইত্যাদি।

(খ) ব্রোঞ্জ - ব্রোঞ্জ নির্মিত ধর্মীয় মূর্তির পাদদেশেও অভিলেখ খোদাই করা হত। ব্রোঞ্জ সীলের ব্যবহার ছিল প্রচুর। কখনো পৃথক ভাবে, আবার কখনো তাম্রশাসনের সঙ্গে অনেক ব্রোঞ্জ সীল অভিলেখ পাওয়া যায়। সহগৌরা অভিলেখ যদিও তাম্রাভিলেখ হিসেবেই প্রচলিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ব্রোঞ্জ প্রভৃতি মিশ্রধাতুর পট্টে উৎকীর্ণ, এই অভিলেখটিই ব্রোঞ্জ উপাদানে রচিত অভিলেখের মধ্যে প্রাচীনতম। এছাড়া হুবিষ্ককালীন খাওয়াত ব্রোঞ্জ দানি অভিলেখ, চীনদেশে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ বৌদ্ধমূর্তি, সৌরাষ্ট্রে প্রাপ্ত জৈন ব্রোঞ্জ অভিলেখ উল্লেখ্য। ব্রোঞ্জ সীল, স্মারকসম্পুট (relic casket) প্রভৃতিও পাওয়া যায়।

(গ) পিত্তল - পিত্তল অথবা এইধরনের ধাতুর তৈরি জৈন ভাস্কর্যগুলিতে অভিলেখ খোদাই করা হত, কিছু ব্রাহ্মণ্য অভিলেখও অবশ্য পিতলের উপাদানে লব্ধ। পিতলের সীল, ত্রিশূল, আবার হিমালয় অঞ্চল থেকে পিতলের তৈরি রাজা বা দৈব পুরুষদের অষ্টধাতুর তৈরি মুখোশেও কিছু অভিলেখ পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্যারিসে রক্ষিত "court mask" ও এইরকম একটি মুখোশ।

(ঘ) **লৌহ** - লৌহ নির্মিত উপাদানে অভিলেখ খুবই কম। এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল- রাজা চন্দ্রের মেহরৌলি স্তম্ভাভিলেখ। পরবর্তীকালে লৌহ নির্মিত অস্ত্রে বিশেষ করে কামানে বেশিরভাগ ইসলামিক ভাষাতে) কখনো সংস্কৃততেও রচিত অভিলেখ পাওয়া গেছে (অজয়গড় কামান অভিলেখ সংস্কৃতে রচিত) ।

(ঙ) **স্বর্ণ** - বুদ্ধের উদ্দেশ্যে রচিত কিছু স্তোত্র,ধর্মীয় নথি কখনো কখনো সোনার পাতে উৎকীর্ণ করা হত। এদের মধ্যে তক্ষশিলা থেকে প্রাপ্ত খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা একটি স্বর্ণফলক, সেনবর্মার সুবর্ণ ফলক এবং দুটি স্বর্ণাঙ্গুরীরাভিলেখ উল্লেখযোগ্য। মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রদেশে বুদ্ধবাণী উৎকীর্ণ সুবর্ণপত্র এবং উজ্‌বেকিস্থানে খরোষ্টি লিপিতে রচিত সুবর্ণখন্ডে অভিলেখ পাওয়া গেছে। গুপ্তরাজাদের সুবর্ণ মুদ্রাও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

(চ) **রৌপ্য** - স্বর্ণাভিলেখর মতই রৌপ্যাভিলেখগুলিও মূলতঃ বৌদ্ধ নথি ও সেগুলি খরোষ্ঠীলিপিতে লেখা। তক্ষশিলা থেকে প্রাপ্ত রৌপ্যাভিলেখগুলি পানপাত্রে, ফুলদানি, পেয়ালা, থালা প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ। জৈন মন্দিরগুলি থেকে রৌপ্য থালা ও অন্যান্য জিনিসের ওপর রচিত অভিলেখ পাওয়া গেছে। মাণিকিয়ালায়চক্রেও ভট্টিপ্রোলুতে একটি রুপার গোটানো লেখ পাওয়া গেছে। এছাড়া রৌপ্যমুদ্রাতে দানাভিলেখ উৎকীর্ণ রয়েছে।

(ছ) **অন্যান্য ধাতু** - ধাতুর অন্যান্য উপাদানের মধ্যে যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণির সীসার মুদ্রা, মায়ানমারে টিনপট্টে উৎকীর্ণ পালিগ্রন্থ উল্লেখ্য।

(৩) **মৃত্তিকা** :

(ক) **পোড়ামাটি, কাদা** - মৃত্তিকাজাত উপাদানগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি পাওয়া গেছে পোড়ামাটির সীল। প্রায় সমস্ত যুগেই উত্তর ভারত জুড়ে এরূপ অভিলেখ পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ স্তোত্র প্রভৃতিও মৃত্তিকাজাত উপাদানগুলিতে উৎকীর্ণ হত। হরিয়ানাতে রামায়ণের দৃশ্যসম্বলিত অভিলেখ পোড়ামাটির সীলে উৎকীর্ণরূপে পাওয়া গেছে। ধ্রুবস্বামী, বৈনগুপ্ত ও বুধগুপ্তের কাদামাটির হস্তমুদ্রাঙ্ক বিহারে পাওয়া গেছে।

(খ) **ইট** - ইটে লেখা অভিলেখগুলির মধ্যে অনেক বৌদ্ধ ধর্মস্থানে বৌদ্ধ শাস্ত্র বা 'ধারণী' লেখা অভিলেখ পাওয়া গেছে। ইটে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ লেখা অভিলেখ পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতের জগৎপুর নামক স্থান থেকে। জৌনপুর থেকে পাওয়া ইটের ওপর উৎকীর্ণ আইনি নথি পাওয়া গেছে।

(গ) **মৃৎপাত্র** – পাকিস্থান (টোর-ঢেরাই, পেশোয়ার), আফগানিস্তান-উজ্‌বেকিস্তান ও ভারতবর্ষের অন্ধ্রপ্রদেশে দানমূলক বৌদ্ধভিলেখগুলি মাটির পাত্রে উৎকীর্ণ। এছাড়া গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশের অ-বৌদ্ধ স্থানেও মৃৎপাত্রে অভিলেখ উৎকীর্ণ আছে।

(ক) **কাষ্ঠ** - প্রাচীন ভারতে কাঠের ওপর যে বহুল পরিমাণে লেখা হত, তার প্রমাণ অনেক সাহিত্য, শিল্পকলার নিদর্শন থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু জলবায়ুগত কারণে সেসব বিনষ্ট হয়ে গেছে। তবে কিরারী নামক স্থান থেকে একটি কাষ্ঠ স্তম্ভাভিলেখ এবং ভাজা এর চৈত গুহার একটি কাষ্ঠ খুঁটিতে অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(৪) **অন্যান্য উপাদান :** উপরিউক্ত উপাদান ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুতে অভিলেখ উৎকীর্ণ হয়েছে। যেমন-

(ক) **স্ফটিক** - স্ফটিক বা ক্রিস্টালে কিছু অভিলেখ বিশেষতঃ সীল পাওয়া যায়। ভট্টিপ্রোলু স্তূপ থেকে প্রাচীন অভিলেখ সমন্বিত একটি ষড়ভুজাকার স্ফটিক পাওয়া গেছে।

(খ) **কাঁচ** - পাটনাতে কিছু কাঁচে উৎকীর্ণ সীল পাওয়া যায়।

(গ) **কাপড়** - মধ্যযুগীয় সময়কার অনেক জৈন অভিলেখ কাপড়ে লেখা হত বলে জানা যায়। চীনের লৌলান এবং মীরান নামক স্থান থেকে ও মধ্য এশিয়া থেকে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে কাপড়ের ওপর লেখা অভিলেখ পাওয়া গেছে।

(ঘ) **হাতির দাঁত ও হাড়ে** ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ কিছু অভিলেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে, যেমন- ভীটা, রুপার, কৌশাম্বী, বেসনগর এবং ত্রিপুরী।

(ঙ) **প্রাণির শক্ত খোলায়** লেখা প্রাকৃত অভিলেখ পাওয়া গেছে অন্ধ্রপ্রদেশের সালিহুণ্ডম্ নামক স্থানে। এছাড়া কচ্ছপের শক্ত খোলায় দুটি বৌদ্ধ অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলাদেশের বসুপাড়া থেকে।